SANDHAN • ISSN : 2349-0136
৮ বর্ষ • ১ সংখ্যা • ২০২১

সন্ধান

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিক

জীবনের সংকট

মৃত্যুর ইশারা

বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে

SANDHAN

An International Peer-Reviewed (Refereed) Research Journal on Society, Cultural & Literature

ISSUE 8, Vol. 1 • May 2021

1st Edition : November 2021

ISSN : 2349-0136

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০২১

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২১

আলোচনার মূল ফোকাস

প্রান্তিক মানুষের সংকট : বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে

বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যু : বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে

মহামারী, মন্বন্তর ও মৃত্যু : বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে

সংকট ও উত্তরণ : বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে

SANDHAN

Chief Advisor	:	Swami Shastrajnananda
		Selina Hossin
		Ramkumar Mukhopadhyay
		Soma Bandyopadhyay
		Sadhan Chattopadhyay
		Sushil Saha
President	:	Biplab Majee
Vice-President	:	Tapan Mandal
Editor	:	Debarati Mallik
Joint Editor	:	Tapas Pal
Editor-in-Chief	:	Dipankar Mallik
e-mail	:	sandhangouriculture@gmail.com
Website	:	www.diyapublication.com
facebook	:	সন্ধান একটি গবেষণা পত্রিকা

ISSN 0976-9463

9 770976 946008 >

বিষয় সূচি

আলোচনার বিষয়—প্রান্তিক মানুষের সংকট : বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিকতা ১
সনৎকুমার নস্কর

প্রান্তিক বাঙালির খ্রিস্টীয় জীবনবোধ : অবলম্বন 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ২২
মৃদুল ঘোষ

প্রান্ত সুন্দরবনের চরবাসী মাছমারাদের জীবনসংকট ও বাংলা উপন্যাস ৩০
শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতাপ ও নিম্নবর্গের প্রান্তিকীকরণ : প্রসঙ্গ 'নীল ময়ূরের যৌবন' ৪৫
শাহনাজ বেগম

অনিল ঘড়াইয়ের নির্বাচিত ছোটোগল্পে প্রান্তিক মানুষের সংকটের বহুমাত্রিকতা ৫০
সুশান্ত সাঁতরা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প সুন্দরবনের প্রকৃতি-প্রতিবেশ ও নিম্নবর্গীয় জীবন ৫৭
শ্যামল দে

'ভেবেছিলাম' : ছোটোগল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ—নিম্নবিত্তের রূপকার ৬৪
শর্মিষ্ঠা ধাড়া

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ছোটোগল্পে সমাজের প্রতাপ ও ব্রাত্যজনের সংকট ৭০
দেবাশীষ রক্ষিত

পরিবর্তিত গ্রামীণ সংস্কৃতি প্রসঙ্গ : সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত ছোটোগল্প ৭৭
বিকাশ কালিন্দী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটোগল্পে প্রান্তিক মানুষের সংকটের চিত্ররূপ ৮১
চুমকি সাহা

অভিজিৎ সেনের 'বর্গক্ষেত্র' : প্রান্তিক মানুষের সংকট ৮৭
রোকেয়া পারভীন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের গল্পে মন্বন্তরক্লিষ্ট সমাজের চিত্র
সুদীপ কোলে

'নবান্ন' : মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের চিত্ররূপ
তাপস মন্ডল

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক : সংকট ও উত্তরণের প্রেক্ষিতে
সোমদত্তা ঘোষ (কর)

তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটকে মন্বন্তর পরবর্তী সমাজ ও মানুষ
টিটু ঘোষ

মন্বন্তর থেকে উত্তরণ : বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' ও তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটক
সুশান্ত রজক

বাংলা নাটকে কৃষক জীবন ও মন্বন্তর
অমিতাভ বিশ্বাস

৫৮ মনোজ মিত্রের 'তক্ষক' : মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তার জয় ঘোষণা
রচনা রায়

বাংলা সাহিত্যে মন্বন্তর, মহামারি ও মৃত্যু
সবুজ কান্তি দাস

বাংলা সাহিত্যে অর্থাভাব, অন্নাভাব ও মৃত্যুর চিত্র
মাধবী বিশ্বাস

'বনলতা সেন' কাব্যে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু-চেতনা
মৃন্ময় কুমার মাহাতো

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের গল্প (নির্বাচিত) : মৃত্যু-পটভূমে মননের অন্বেষণ
কিশোর কুমার রায়

সেলিম আল দীনের নাটকে মৃত্যু চেতনা
কৌষেয়ী ব্যানার্জি

আলোচনার বিষয়—সংকট ও উত্তরণ : বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্যে

বাংলা উপন্যাস : সংকট ও সমাধান
সাধন চট্টোপাধ্যায়

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' নাটক : সংকট ও উত্তরণের প্রেক্ষিতে

সোমদত্তা ঘোষ (কর)

বর্তমানে অতিমারির ভয়াবহ প্রকোপে সারা বিশ্ব আজ চরম সংকটের মুখোমুখি। মানুষ এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় বার করার চেষ্টা করছে। এই প্রেক্ষিতেই সৃষ্টি হচ্ছে গল্প, উপন্যাস, নাটক। এই সময়কাল ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ার পথে। তবে এর পূর্বেও মহামারির প্রকোপে বিশ্বের মানুষ নানা সময়ে, নানা স্থানে বিপর্যস্ত হয়েছে, আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। এমনই এক সময়পর্ব চল্লিশের দশক, যখন দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, মহামারি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু সমস্যা—এই সকল সংকটের পটভূমিকা পর্যবেক্ষণ করেছে বাংলার মানুষ। এই দশকেই বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে ও বাংলা রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা, তৈরি হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, শুরু হয় গণনাট্য আন্দোলন। এই গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হলেন বিজন ভট্টাচার্য (১৯১৭-১৯৭৮)। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন গ্রামের সাধারণ মানুষের মুক্তিতেই নাট্যশিল্পের মুক্তি। গণনাট্য সংঘের যাত্রা সূচিত হয়েছিল তাঁর লেখা 'আগুন' এই একাঙ্ক নাটকের মাধ্যমে ১৯৪৩ সালে। মহামারি, দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে এই বছরই তিনি লেখেন দ্বিতীয় একাঙ্ক নাটক 'জবানবন্দী'। এই 'জবানবন্দী' নাটকে নাটককার সংকট ও তার থেকে উত্তরণের প্রেক্ষিত কীভাবে তুলে ধরেছেন, তা আলোচনাসাপেক্ষ।

দুই

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অস্থির সময়ের সূচনা ঘটে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও আসে পরিবর্তন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নীতি ও আদর্শকে মেনে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে নিয়ে আসে সাম্যবাদী চেতনা। বামপন্থী দলগুলোর নেতৃত্বে পরিচালিত থিয়েটার শিল্পীদের সংগঠন হলো ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, যা ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা। প্রাথমিক পর্বে এই সংগঠনের সদস্যরা ছিলেন উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, পৃথ্বীরাজ কাপুর, সলিল চৌধুরী, নিরঞ্জন সিং মান প্রমুখ—

ভাবে, ভাবনায়, চিন্তা-চেতনায়, সংগ্রামে, প্রতিরোধে, প্রগতিশীল জীবনদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়ে

নাটক রচনা ও নাট্যাভিনয়ে যুগান্তকারী সূচনা করেছিল 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। গতানুগতিক বাণিজ্যিক থিয়েটারের ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল গণনাট্যের জীবনমুখী ও সংগ্রামমুখর নাট্য আন্দোলনের ধারা।... বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যরচনা, অভিনয়, পরিচালনা সর্বাঙ্গীন বুপলাভ করেছিল গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এই আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদেরই ভাবনায় ভাবিত ও উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নাট্যচর্চায় প্রয়াসী হলেন। অর্থাৎ বাংলা থিয়েটারের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে বিজন ভট্টাচার্যের আবির্ভাব।[১]

তিন

গণনাট্য সংঘের যাত্রা সূচিত হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম একাঙ্ক নাটক 'আগুন' (১৯৪৩)-এর মাধ্যমে। গণনাট্য সংঘের সবসময়ের কর্মী হয়ে তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের সংকটময় জীবনযাত্রাকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। সেই প্রত্যক্ষজাত উপলব্ধির বাস্তব বুপ প্রকাশ পেল তাঁর নাটকে। দুর্ভিক্ষ, মহামারির ভয়াবহ প্রেক্ষিতে এই বছরই লেখেন তাঁর দ্বিতীয় একাঙ্ক নাটক 'জবানবন্দী'। এই নাটকটিকে তাঁর লেখা তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ, জনপ্রিয় নাটক 'নবান্ন' (১৯৪৪)-র প্রাক্ খসড়া বলা যেতে পারে। জবানবন্দি যেখানে শেষ, সেখানেই যেন 'নবান্ন'-এর শুরু। এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হলো 'জীয়নকন্যা', 'মরাচাঁদ', 'দেবীগর্জন', 'গোত্রান্তর', 'হাঁসখালির হাঁস' ইত্যাদি।

চার

সাধনকুমার ভট্টাচার্য 'একাঙ্ক সঞ্চয়ন' গ্রন্থে (একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ, পৃ. ১৫) একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞায় বলেছিলেন—'একাঙ্ক নাটিকা হচ্ছে সেই শ্রেণির দৃশ্যকাব্য যার 'কার্য' একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্পায়তনে উপস্থাপিত হয়।' এই সংজ্ঞাটি মোটামুটিভাবে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তিদোষ থেকে মুক্ত। দ্ব্যঙ্ক, ত্র্যঙ্ক, চতুরঙ্ক এবং পঞ্চাঙ্ক নাটক থেকে একাঙ্কিকার পার্থক্য এখানেই যে একাঙ্কের কার্য একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে উপস্থাপিত হয়, অন্যদিকে একাঙ্ক বড়ো নাটক অর্থাৎ বৃহদায়তন বৃত্তের পঞ্চাঙ্ক নাটক কল্প নাটক থেকে একাঙ্ক নাটিকার পার্থক্য রয়েছে সেখানেই যেখানে একাঙ্কিকা স্বল্পায়তন বৃত্তের দৃশ্য কাব্য। একাঙ্ক নাটকের মধ্যে একটা বিশেষ ফোকাশ পয়েন্টকে কেন্দ্র করেই নাটক অগ্রসর হয়। তাই কাহিনির একমুখিনতা বিশেষ গুরুত্ব পায়। একমুখিন কাহিনি ও বিষয়ের নির্দিষ্টতার জন্য একাঙ্ক নাটকের চরিত্রসংখ্যা হয় অল্পসংখ্যক। স্থান, কাল, কার্যের ঐক্য থাকবে এবং এক বিষয়বস্তু বা চরিত্র বা বক্তব্য থাকবে একাঙ্ক নাটকে। নাটকের সংলাপ হবে ছোটো, ব্যঞ্জনাধর্মী। সংক্ষিপ্ততা ও বাহুল্যবর্জন একাঙ্ক নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আলোচ্য 'জবানবন্দী' নাটকটি চারটি দৃশ্যে বিভক্ত। মহামারিতে বিপর্যস্ত, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষেরা যখন বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয় এবং তখন শহরে এসে সেখানকার মানুষের নিস্পৃহতা, লোভ ও লালসার শিকার হয়, সেই চিত্র যেমন নাট্যকার দেখিয়েছেন, তেমনই এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও আগামীদিনের সুসময়ের প্রত্যাশায় কিছু মানুষের সংগ্রামের, উত্তরণের চিত্রও তুলে ধরেছেন 'জবানবন্দী' নাটকে।

পাঁচ

২৯ অক্টোবর, ১৯৪৩-এ 'অরণি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত এই নাটক স্টার থিয়েটারে ৩ জানুয়ারি, ১৯৪৪-এ মঞ্চস্থ হয় গণনাট্য সংঘের ব্যানারে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথী' নাটকের সঙ্গে। 'জবানবন্দী' নাটকের বিষয়বস্তুতে পাওয়া যায় 'গণনাট্যের চেতনা'। মাস অর্থাৎ গণ উঠে এল মঞ্চে। এই জনগণ ১৩৫০ এর মন্বন্তরের শিকার। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে ভয়াবহ ঝড়, বন্যায় সেখানকার মানুষের জীবন হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগই জনজীবন, অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার কারণ। এর ফলে মানুষ অনেকসময় বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য হয়। অর্থাভাব, অন্নাভাবের কারণে মানুষকে অনেক সময়েই সামাজিক ও ব্যক্তিক অবক্ষয়ের পথে. চালিত হতে হয়। এই সংকটের মধ্যেও মানুষ উত্তরণের রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করে। ১৯৪২ সালে ১১ নভেম্বর 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশ পায় কাঁথি, তমলুক এবং বালেশ্বর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে ঝড় ও বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়ার সংবাদ। আবার ২৭ জানুয়ারি, ১৯৪৩ সালে এই পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বন্যা ও মহামারিতে হাজার হাজার মানুষ শহরের রিলিফ কমিটির খাদ্যের ভরসায় শহরে এসে অসহায়ভাবে খাদ্যের জন্য দাবি জানাতে থাকে। আবার এই পত্রিকাতেই ৩ নভেম্বর, ১৯৪৩ এ জানায়—যারা খাদ্যের আশায় শহরে এসেছিল, খাদ্য না পেয়ে, আশ্রয় না পেয়ে, বস্ত্র না পেয়ে তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। মেয়েরা অসৎ চরিত্র হতে বাধ্য হচ্ছে।' এই সমকালীন প্রেক্ষিতেই 'জবানবন্দী' নাটকের প্রেরণা।

মণিবিল্বপুরের মাথাল গাঁয়ের কৃষক পরিবারের কর্তা পরান মন্ডল বন্যার জন্য পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে সপরিবারে অন্নময় ভবিষ্যতের আশায় কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হয়। সব কিছু ফেলে রেখে স্ত্রী, দুই পুত্র বেন্দা ও পদা, বেন্দার বৌ, নাতি মানিক ও দুই প্রতিবেশী রাইচরণ আর হাসি, রমজানকে নিয়ে শহরে চলে আসে পরান—

প্রথম দৃশ্যে সূর্যোদয়ের আগে আলো-আঁধারের 'আবছা আবছা' পটে পরান মন্ডলের সমর্থ পুত্র ও প্রতিবেশীদের গ্রাম থেকে এই নিষ্ক্রমণ এক সামাজিক দ্যোতনায় অর্থপূর্ণ। পুরোনো জনসমাজের জীবনে যে ছেদ তৈরি হচ্ছে, তার স্থিতি যেভাবে নড়ে যাচ্ছে তৎসম্বদত ওই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মধ্যেই সূর্যালোকের প্রথম উদ্ভাসে দেখা যায় পরানের জরাজীর্ণ খোড়ো কুটির।' ভিটে মাটি ছেড়ে যাওয়ার আগে বৃদ্ধের প্রাণ কেঁদে ওঠে "আমার সুখির সংসার! হায় পরমেশ্বর!" (১ম দৃশ্য) পরানের ঈশ্বরপ্রীতি ছেলে বেন্দার কাছে 'বোটকারা' (ঠাট্টা)। এখানে নাট্যকার পিতাপুত্রের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন। পুত্রের সংস্কারমুক্ত বাস্তববাদী মন প্রাধান্য পেয়েছে।

'জবানবন্দী'র পরবর্তী পর পর তিনটি দৃশ্যই শহরের বড়ো রাস্তার ধারে একটি রেলিং-এর পাশে ছেঁড়া চট আর ছেঁড়া মাদুর দিয়ে বানানো ছোট্ট আস্তানাকে ঘিরে আবর্তিত। দুটো ভাতের আশায় যারা শহরে এসেছিল, তাদের কারো ভাত জোটেনি। লঙ্গরখানা থেকে যে খিচুড়ি দিত, তাতে কারো খিদে মিটত না। তখন তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য দাঁড়াচ্ছিল নিজে বেঁচে থাকা। তাই ২য় দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে এক ভয়াবহ পরিণাম। যে বেন্দার মা গ্রাম

থেকে আসার সময় নাতির জন্য স্নেহভরে বলে, "আগে গেলে মানিক আমার খেয়ে বাঁচত", সে-ই লঙ্গারখানা থেকে খিচুড়ি দিলে, "চকিতে বুড়ো পরান আর বেন্দার বৌ-এর দিকে এক নজর তাকিয়ে ঘুরে বসে খিচুড়ির হাড়ি সমুখে করে, তারপর গোগ্রাসে খিচুড়ির হাড়িটা নিঃশেষ করে ফেলতে থাকে। পেছন থেকে মানিক এসে ঘ্যান ঘ্যান করে একটু খিচুড়ির জন্যে, বেন্দার মা (পরানে বউ) ফিরেও তাকায় না।" (২য় দৃশ্য)

নাট্যকার সচেতনভাবে চরিত্রের পরিবর্তনকে, রূঢ়তাকে তুলে ধরেছেন। এই দৃশ্যেই দেখা যায় খিদেতে 'আধসেদ্ধ ভেঁটে চালির খিচুড়ি' খেয়ে পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় মানিকের অকালমৃত্যু, সবার অসহায় দর্শক হয়ে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ করা। নাট্যকার এখানে এক 'Anti action' সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকের ৩য় দৃশ্যের কাহিনি আরও মর্মান্তিক। অভুক্ত পরান মন্ডল অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই দৃশ্যেই বেন্দার বৌ অভাবের তাড়নায় শরীর বেচতে বাধ্য হয়। বেন্দা বলে "ঐ সেই পরমেশ্বর আর এই এক ভদ্দরলোক, সর্বনাশ করে ছাড়লে একেবারে আমাদের।" (৩য় দৃশ্য) নির্দয়, অমানবিক শহরের ভদ্রলোকবেশী কামুক মানুষেরা সেইসময় অসহায়, অনাহারক্লিষ্ট গ্রামের মানুষদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে ও নিজেদের ভোগ চরিতার্থ করেছে। একদিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িতের ছবি, অন্যদিকে এক মুখোশ পরা শহুরে ভদ্রলোকের ছবি। এই দুই-এর সংযোগে এই নাটকে নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন এক নাটকীয় আয়রনি। নাটকের চতুর্থ দৃশ্য বা শেষ দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছে পরান মণ্ডলের মৃত্যু দিয়ে। মুর্মূষু পরান মণ্ডলকে ঘিরে আছে গ্রামের মানুষেরা। পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বেন্দা। নাটকের প্রধান চরিত্র পরান মণ্ডলের মৃত্যুর পূর্বের 'জবানবন্দী' নাটকটিকে অন্য মাত্রা দান করে।—"তোরা সব ঘরে ফিরে যা, ঘরে ফিরে যা। আমার সেই মরচে পরা নাঙ্গাল কখানা আবার শক্ত করে, শক্ত করে চেপে ধর গে মাটিতি। খুব শকত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা সোনা ফলবে, সোনা ফলবে।" (চতুর্থ দৃশ্য) 'জবানবন্দী'র এই গ্রামীণ মানুষদের গণআন্দোলন একসময় বাংলাদেশের সীমা অতিক্রম করে নগর ও অন্যগ্রামের মানুষকেও সঞ্জীবিত করেছিল। পরান মণ্ডলের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এক নতুন জীবনবোধ, উত্তরণের জয়গান সূচিত হয়েছে। নাটকের শেষে গ্রামের মানুষেরা গ্রামে ফিরে যাওয়ার সংকল্পে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ছুঁড়ে দেয়। সমাজগঠনের নতুন চেতনা রিয়ালিস্টিকভাবে রূপায়িত হয়েছে 'জবানবন্দী' নাটকে।

ছয়

'জবানবন্দী'র চার দৃশ্য সমন্বিত নাট্য ফর্ম সম্পর্কে চলচ্চিত্রকার বলরাজ সাহনি বলেছিলেন—"আজ অবধি যে সব নাটকের গঠনভঙ্গি আমার সুষম বলে মনে হয়েছে এবং যে সব নাটক আমাকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে 'জবানবন্দী' অন্যতম প্রধান।"(খাজা আহম্মদ আব্বাস, বহুরূপী ৩৩,১৯৬৯ খ্রি.)

তিনি নেমিচাঁদ জৈনের হিন্দী অনুবাদ 'অনতিম অভিলাষ' প্রথমে পড়েছিলেন। এটি 'জবানবন্দী'র অনুবাদ। এই নাটকে প্রতিরোধ দুটি বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে। একটি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার অত্যাচারের শিকার সপরিবারে পরান মণ্ডল ও তার দুই প্রতিবেশী। প্রকৃতির

বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াই। আর একটি হলো শহরের পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সংঘবদ্ধ সৎ ভাবনার উদ্দীপনেই নাটকের আশার সুর ধ্বনিত। ১৯৪৪-এর প্রথম পর্বের বাংলাদেশ ও তার আবহ ধরা পড়েছে এই নাটকে। নাটকের নামকরণও অর্থবাহী। দুঃখের মধ্যে নতুন বাঁচার স্বপন দেখিয়েছে নাটকের শেষ দৃশ্যে পরান মণ্ডলের জবানবন্দি। নাটকটি শেষ পর্যন্ত যথার্থভাবেই হয়ে উঠেছে গণদের নাটক, 'Proletarian literature' বা 'গণমুখী সাহিত্য'। নাটকটি একমুখী। প্রত্যেকটি দৃশ্য পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়েও স্বতন্ত্র। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে বলেছেন—

> Communism is a social philosophy born out of your own moraqss, yours own soil and people and life and experience. So it must give shape and colour accordingly. All for what? For the people, the soils of soil. The philosophy must suit the people. (বিজন ভট্টাচার্য সাক্ষাৎকার, বহুরূপী, ১৯৭৮)

তাই সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়েও যে শেষ পর্যন্ত উত্তরণের রাস্তা দেখিয়েছে এই নাটক, জনগণের বলিষ্ঠ সংঘবদ্ধ জীবনের কথা, আত্মপ্রত্যয়ের সুর শোনা গেছে এই 'জবানবন্দী' নাটকে, তাই বর্তমান প্রেক্ষিতে এই নাটক এতটাই প্রাসঙ্গিক।

উৎসের সন্ধানে

১. অপূর্ব দে : 'গণের নাটককার বিজন ভট্টাচার্য', শতায়ু বিজন, সম্পাদনা কুন্তল মিত্র, ফণিভূষণ মন্ডল, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০১৮, পৃ. ১৩০-১৩১

২. শম্পা রায় : 'জবানবন্দী প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা', শতায়ু বিজন, সম্পাদনা কুন্তল মিত্র, ফণিভূষণ মন্ডল, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, বইমেলা ২০১৮, পৃ. ২৩১

তথ্যের সন্ধানে

১. বিজন ভট্টাচার্য : রচনা সংগ্রহ ১, নবারুণ ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮